

শ্রীবিলাস

১

এখানে এক সময়ে নীলকুঠি ছিল। তার সমস্ত ভাঙিয়া-চুরিয়া গেছে, কেবল গুটিকতক ঘর বাকি। দামিনীর মৃতদেহ দাহ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিবার সময় এই জায়গাটা আমার পছন্দ হইল, তাই কিছুদিনের জন্য এখানে রহিয়া গেলাম।

নদী হইতে কুঠি পর্যন্ত যে রাস্তা ছিল তার দুই ধারে সিসুগাছের সারি। বাগানে ঢুকিবার ভাঙা গেটের দুটা থাম আর পাঁচিলের এক দিকের খানিকটা আছে, কিন্তু বাগান নাই। থাকিবার মধ্যে এক কোণে কুঠির কোন্-এক মুসলমান গোমস্তার গোর ; তার ফাটলে ফাটলে ঘন ঝোপ করিয়া ভাঁটিফুলের এবং আকন্দের গাছ উঠিয়াছে, একেবারে ফুলে-ভরা-- বাসরঘরে শ্যালীর মতো মৃত্যুর কান মলিয়া দিয়া দক্ষিণা বাতাসে তারা হাসিয়া লুটোপুটি করিতেছে। দিঘির পাড় ভাঙিয়া জল শুকাইয়া গেছে ; তার তলায় ধোনের সঙ্গে মিলাইয়া চাষিরা ছোলার চাষ করিয়াছে ; আমি যখন সকালবেলায় শেঙলা-পড়া ইঁটের টিবিটার উপরে সিসুর ছায়ায় বসিয়া থাকি তখন ধোনেফুলের গন্ধে আমার মগজ ভরিয়া যায়।

বসিয়া বসিয়া ভাবি, এই নীলকুঠি, যেটা আজ গো-ভাগাড়ে গোরুর হাড়-কখানার মতো পড়িয়া আছে সে যে একদিন সজীব ছিল। সে আপনার চারি দিকে সুখদুঃখের যে ঢেউ তুলিয়াছিল মনে হইয়াছিল সে তুফান কোনোকালে শান্ত হইবে না। যে প্রচণ্ড সাহেবটা এইখানে বসিয়া হাজার হাজার গরিব চাষার রক্তকে নীল করিয়া তুলিয়াছিল, তার কাছে আমি সামান্য বাঙালির ছেলে কে-ই বা ! কিন্তু পৃথিবী কোমরে আপন সবুজ আঁচলখানি আঁটিয়া বাঁধিয়া অনায়াসে তাকে-সুদ্ধ তার নীলকুঠি-সুদ্ধ সমস্ত বেশ করিয়া মাটি দিয়া নিছিয়া পুঁছিয়া নিকাইয়া দিয়াছে-- যা একটু-আধটু সাবেক দাগ দেখা যায় আরো এক পোঁচ লেপ পড়িলেই একেবারে সাফ হইয়া যাইবে।

কথাটা পুরানো, আমি তার পুনরুক্তি করিতে বসি নাই। আমার মন বলিতেছে, না গো, প্রভাতের পর প্রভাতে এ কেবলমাত্র কালের উঠান-নিকানো নয়। এই নীলকুঠির সাহেবটা আর তার নীলকুঠির বিভীষিকা একটুখানি ধুলার চিহ্নের মতো মুছিয়া গেছে বটে-- কিন্তু আমার দামিনী !

আমি জানি, আমার কথা কেহ মানিবে না। শংকরাচার্যের মোহমুদ্গর কাহাকেও রেহাই করে না। মায়াময়মিদমখিলং ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু শংকরাচার্য ছিলেন সন্ন্যাসী-- কা তব কাস্তা কস্তে পুত্রঃ-- এ-সব কথা তিনি বলিয়াছিলেন, কিন্তু এর মানে বুঝেন নাই। আমি সন্ন্যাসী নই, তাই আমি বেশ করিয়া জানি, দামিনী পদ্মের পাতায় শিশিরের ফোঁটা নয়।

কিন্তু শুনিতে পাইড্ড গৃহীরাও এমন বৈরাগ্যের কথা বলে। তা হইবে। তারা কেবলমাত্র গৃহী, তারা হারায় তাদের গৃহীকে। তাদের গৃহও মায়া বটে, তাদের গৃহীও তাই। ও-সব যে হাতে-গড়া জিনিস, ঝাঁট পড়িলেই পরিষ্কার হইয়া যায়।

আমি তো গৃহী হইবার সময় পাইলাম না ; আর সন্ন্যাসী হওয়া আমার ধাতে নাই, সেই আমার রক্ষা। তাই আমি যাকে কাছে পাইলাম সে গৃহী হইল না, সে মায়া হইল না, সে সত্য রহিল, সে শেষ পর্যন্ত দামিনী। কার সাধ্য তাকে ছায়া বলে ?

দামিনীকে যদি আমি কেবলমাত্র ঘরের গৃহিণী করিয়াই জানিতাম তবে অনেক কথা লিখিতাম না। তাকে আমি সেই সম্বন্ধের চেয়ে বড়ো করিয়া এবং সত্য করিয়া জানিয়াছি বলিয়াই সব কথা খোলসা করিয়া লিখিতে পারিলাম, লোকে যা বলে বলুক।

মায়ার সংসারে মানুষ যেমন করিয়া দিন কাটায় তেমন করিয়া দামিনীকে লইয়া যদি আমি পুরামাত্রায় ঘরকন্না করিতে পারিতাম তবে তেল মাখিয়া স্নান করিয়া আহারাঙ্তে পান চিবাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতাম, তবে দামিনীর মৃত্যুর পরে নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিতাম ‘সংসারোহমতীৰ বিচিত্রঃ’, এবং সংসারের বৈচিত্র্য আবার একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য কোনো একজন পিসি বা মাসির অনুরোধ শিরোধার্য করিয়া লইতাম। কিন্তু পুরাতন জুতাজোড়াটার মধ্যে পা যেমন ঢোকে তেমন অতি সহজে আমি আমার সংসারের মধ্যে প্রবেশ করি নাই। গোড়া হইতেই সুখের প্রত্যাশা ছাড়িয়াছিলাম। না, সে কথা ঠিক নয়-- সুখের প্রত্যাশা ছাড়িব এতবড়ো অমানুষ আমি নই। সুখ নিশ্চয়ই আশা করিতাম, কিন্তু সুখ দাবি করিবার অধিকার আমি রাখি নাই।

কেন রাখি নাই? তার কারণ, আমিই দামিনীকে বিবাহ করিতে রাজি করাইয়াছিলাম। কোনো রাঙা চেলির ঘোমটার নীচে শাহানা রাগিণীর তানে তো আমাদের শুভদৃষ্টি হয় নাই! দিনের আলোতে সব দেখিয়া-শুনিয়া জানিয়া-বুঝিয়াই এ কাজ করিয়াছি।

লীলানন্দস্বামীকে ছাড়িয়া যখন চলিয়া আসিলাম তখন চালচুলার কথা ভাবিবার সময় আসিল। এতদিন যেখানে যাই খুব ঠাসিয়া গুরুর প্রসাদ খাইলাম, ক্ষুধার চেয়ে অজীর্ণের পীড়াতেই বেশি ভোগাইল। পৃথিবীতে মানুষকে ঘর তৈরি করিতে, ঘর রক্ষা করিতে, অন্তত ঘর ভাড়া করিতে হয়, সে কথা একেবারে ভুলিয়া বসিয়াছিলাম; আমরা কেবল জানিতাম যে, ঘরে বাস করিতে হয়। গৃহস্থ যে কোন্‌খানে হাত-পা গুটাইয়া একটুখানি জায়গা করিয়া লইবে সে কথা আমরা ভাবি নাই, কিন্তু আমরা যে কোথায় দিব্য হাত-পা ছড়াইয়া আরাম করিয়া থাকিব গৃহস্থেরই মাথায় মাথায় সেই ভাবনা ছিল।

তখন মনে পড়িল জ্যাঠামশায় শচীশকে তাঁর বাড়ি উইলে লিখিয়া দিয়াছেন। উইলটা যদি শচীশের হাতে থাকিত তবে এতদিনে ভাবের স্রোতে রসের ঢেউয়ে কাগজের নৌকাখানার মতো সেটা ডুবিয়া যাইত। সেটা ছিল আমার কাছে, আমিই ছিলাম একজিকুটর। উইলে কতকগুলি শর্ত ছিল, সেগুলো যাহাতে চলে সেটার ভার আমার উপরে। তার মধ্যে প্রধান তিনটা এই, কোনোদিন এ বাড়িতে পূজা-অর্চনা হইতে পারিবে না, নীচের তলায় পাড়ার মুসলমান চামার ছেলেদের জন্য নাইটস্কুল বসিবে, আর শচীশের মৃত্যুর পর সমস্ত বাড়িটাই ইহাদের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য দান করিতে হইবে। পৃথিবীতে পুণ্যের উপরে জ্যাঠামশায়ের সব চেয়ে রাগ ছিল; তিনি বৈষয়িকতার চেয়ে এটাকে অনেক বেশি নোংরা বলিয়া ভাবিতেন, পাশের বাড়ির ঘোরতর পুণ্যের হাওয়াটাকে কাটাইয়া দিবার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইংরাজীতে তিনি ইহাকে বলিতেন স্যানিটারি প্রিকশন্স।

শচীশকে বলিলাম, চলো এবার সেই কলিকাতার বাড়িতে।

শচীশ বলিল, এখনো তার জন্য ভালো করিয়া তৈরি হইতে পারি নাই।

তার কথা বুঝিতে পারিলাম না। সে বলিল, একদিন বুদ্ধির উপর ভর করিলাম, দেখিলাম সেখানে জীবনের সব ভার সয় না। আর একদিন রসের উপর ভর করিলাম, দেখিলাম সেখানে তলা বলিয়া জিনিসটাই নাই। বুদ্ধিও আমার নিজের, রসও যে তাই। নিজের উপরে নিজে দাঁড়ানো চলে না। একটা আশ্রয় না পাইলে আমি শহরে ফিরিতে সাহস করি না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কী করিতে হইবে বলো।

শচীশ বলিল, তোমরা দুজনে যাও, আমি কিছুদিন একলা ফিরিব। একটা যেন কিনারার মতো দেখিতেছি, এখন যদি তার দিশা হারাই তবে আর খুঁজিয়া পাইব না।

আড়ালে আসিয়া দামিনী আমাকে বলিল, সে হয় না। একলা ফিরিবেন, উঁহার দেখাশুনা করিবে কে? সেই যে একবার একলা বাহির হইয়াছিলেন, কী চেহারা লইয়া ফিরিয়াছিলেন সে কথা মনে করিলে আমার ভয় হয়।

সত্য কথা বলিব? দামিনীর এই উদ্বেগে আমার মনে যেন একটা রাগের ভিমরুল ছল ফুটাইয়া দিল, জ্বালা করিতে লাগিল। জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পর শচীশ তো প্রায় দু বছর একলা ফিরিয়াছিল, মারা তো পড়ে নাই। মনের ভাব চাপা রহিল না, একটু ঝাঁজের সঙ্গেই বলিয়া ফেলিলাম।

দামিনী বলিল, শ্রীবিলাসবাবু, মানুষের মরিতে অনেক সময় লাগে সে আমি জানি। কিন্তু একটুও দুঃখ পাইতে দিব কেন, আমরা যখন আছি।

আমরা! বহুবচনের অন্তত আধখানা অংশ এই হতভাগা শ্রীবিলাস। পৃথিবীতে এক দলের লোককে দুঃখ হইতে বাঁচাইবার জন্য আর-এক দলকে দুঃখ পাইতে হইবে। এই দুই জাতের মানুষ লইয়া সংসার। আমি যে কোন্ জাতের দামিনী তাহা বুঝিয়া লইয়াছে। যাক, দলে টানিল এই আমার সুখ।

শচীশকে গিয়া বলিলাম, বেশ তো, শহরে এখনই নাই গেলাম। নদীর ধারে ঐ যে পোড়ো বাড়ি আছে ওখানে কিছুদিন কাটানো যাক। বাড়িটাতে ভূতের উৎপাত আছে বলিয়া গুজব, অতএব মানুষের উৎপাত ঘটবে না।

শচীশ বলিল, আর তোমরা?

আমি বলিলাম, আমরা ভূতের মতোই যতটা পারি গা-ঢাকা দিয়া থাকিব।

শচীশ দামিনীর মুখের দিকে একবার চাহিল। সে চাহনিতে হয়তো একটু ভয় ছিল।

দামিনী হাত জোড় করিয়া বলিল, তুমি আমার গুরু। আমি যত পাপিষ্ঠা হই আমাকে সেবা করিবার অধিকার দিয়ো।

২

যাই বল, আমি শচীশের এই সাধনার ব্যাকুলতা বুঝিতে পারি না। একদিন তো এ জিনিসটাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছি, এখন আর যাই হোক হাসি বন্ধ হইয়া গেছে। আলেয়ার আলো নয়, এ যে আগুন। শচীশের মধ্যে ইহার দাহটা যখন দেখিলাম তখন ইহাকে লইয়া জ্যাঠামশায়ের চেলাগিরি করিতে আর সাহস হইল না। কোন্ ভূতের বিশ্বাসে ইহার আদি এবং কোন্ অন্ধুতের বিশ্বাসে ইহার অন্ত তাহা লইয়া হার্বাট্ স্পেসরের সঙ্গে মোকাবিলা করিয়া কী হইবেড্ড স্পষ্ট দেখিতেছি শচীশ জ্বলিতেছে, তার জীবনটা এক দিক হইতে আর-এক দিক পর্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল।

এতদিন সে নাচিয়া গাহিয়া কাঁদিয়া গুরুর সেবা করিয়া দিনরাত অস্থির ছিল, সে একরকম ছিল ভালো। মনের সমস্ত চেষ্টা প্রত্যেক মুহূর্তে ফুঁকিয়া দিয়া একেবারে সে নিজেকে দেউলে করিয়া দিত। এখন স্থির হইয়া বসিয়াছে, মনটাকে আর চাপিয়া রাখিবার জো নাই। আর ভাব-সম্মোগে তলাইয়া যাওয়া নয়, এখন উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য ভিতরে ভিতরে এমন লড়াই চলিতেছে যে তার মুখ দেখিলে ভয় হয়।

আমি একদিন আর থাকিতে পারিলাম না; বলিলাম, দেখো শচীশ, আমার বোধ হয় তোমার একজন

কোনো গুরুর দরকার যার উপরে ভর করিয়া তোমার সাধনা সহজ হইবে।

শচীশ বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, চুপ করো বিশ্রী, চুপ করো-- সহজকে কিসের দরকার ? ফাঁকিই সহজ, সত্য কঠিন।

আমি ভয়ে ভয়ে বলিলাম, সত্যকে পাইবার জন্যই তো পথ দেখাইবারডড

শচীশ অধীর হইয়া বলিল, ওগো, এ তোমার ভূগোলবিবরণের সত্য নয়, আমার অন্তর্যামী কেবল আমার পথ দিয়াই আনাগোনা করেনডড গুরুর পথ গুরুর আঙিনাতেই যাওয়ার পথ।

এই এক শচীশের মুখ দিয়া কতবার যে কত উলটা কথাই শোনা গেল ! আমি শ্রীবিলাস, জ্যাঠামশায়ের চেলা বটে, কিন্তু তাঁকে গুরু বলিলে তিনি আমাকে চেলাকাঠ লইয়া মারিতে আসিতেন। সেই-আমাকে দিয়া শচীশ গুরুর পা টিপাইয়া লইল, আবার দুদিন না যাইতেই সেই-আমাকেই এই বক্তৃতা ! আমার হাসিতে সাহস হইল না, গম্ভীর হইয়া রহিলাম।

শচীশ বলিল, আজ আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছি, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ কথাটার অর্থ কী। আর-সব জিনিস পরের হাত হইতে লওয়া যায়, কিন্তু ধর্ম যদি নিজের না হয় তবে তাহা মারে, বাঁচায় না। আমার ভগবান অন্যের হাতের মুষ্টিভিক্ষা নহেন ; যদি তাঁকে পাই তো আমিই তাঁকে পাইব, নহিলে নিধনং শ্রেয়ঃ।

তর্ক করা আমার স্বভাব, আমি সহজে ছাড়িবার পাত্র নই ; আমি বলিলাম, যে কবি সে মনের ভিতর হইতে কবিতা পায়, যে কবি নয় সে অন্যের কাছ হইতে কবিতা নেয়।

শচীশ অস্মলান মুখে বলিল, আমি কবি।

বাস্-- চুকিয়া গেল, চলিয়া আসিলাম।

শচীশের খাওয়া নাই, শোওয়া নাই, কখন কোথায় থাকে হুঁশ থাকে না। শরীরটা প্রতিদিনই যেন অতি-শান-দেওয়া ছুরির মতো সূক্ষ্ম হইয়া আসিতে লাগিল। দেখিলে মনে হইত আর সহিবে না। তবু আমি তাকে ঘাঁটাইতে সাহস করিতাম না। কিন্তু দামিনী সহিতে পারিত না। ভগবানের উপরে সে বিষম রাগ কল্পরত--যে তাঁকে ভক্তি করে না তার কাছে তিনি জন্ম, আর ভক্তের উপর দিয়াই এমন করিয়া তার শোধ তুলিতে হয় গা ? লীলানন্দস্বামীর উপর রাগ করিয়া দামিনী মাঝে মাঝে সেটা বেশ শক্ত করিয়া জানান দিত, কিন্তু ভগবানের নাগাল পাইবার উপায় ছিল না।

তবু শচীশকে সময়মত নাওয়ানো-খাওয়ানোর চেষ্টা করিতে সে ছাড়িত না। এই খাপছাড়া মানুষটাকে নিয়মে বাঁধিবার জন্য সে যে কতরকম ফিকিরফন্দি করিত তার আর সংখ্যা ছিল না।

অনেক দিন শচীশ ইহার স্পষ্ট কোনো প্রতিবাদ করে নাই। একদিন সকালেই নদী পার হইয়া ওপারে বালুচরে সে চলিয়া গেল। সূর্য মাঝ আকাশে উঠিল, তার পরে সূর্য পশ্চিমের দিকে হেলিল, শচীশের দেখা নাই। দামিনী অভুক্ত থাকিয়া অপেক্ষা করিল, শেষে আর থাকিতে পারিল না। খাবারের থালা লইয়া হাঁটুজল ভাঙিয়া সে ওপারে গিয়া উপস্থিত।

চারি দিকে ধূ ধূ করিতেছে, জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই। রৌদ্র যেমন নিষ্ঠুর, বালির ঢেউগুলাও তেমনি। তারা যেন শূন্যতার পাহারাওয়ালা, গুঁড়ি মারিয়া সব বসিয়া আছে।

যেখানে কোনো ডাকের কোনো সাড়া, কোনো প্রশ্নের কোনো জবাব নাই, এমন একটা সীমানাহারা ফ্যাকাশে সাদার মাঝখানে দাঁড়াইয়া দামিনীর বুক দমিয়া গেল। এখানে যেন সব মুছিয়া গিয়া একেবারে গোড়ার সেই শুকনো সাদায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। পায়ের তলায় কেবল পড়িয়া আছে একটা 'না'। তার না

আছে শব্দ, না আছে গতি ; তাহাতে না আছে রক্তের লাল, না আছে গাছপালার সবুজ, না আছে আকাশের নীল, না আছে মাটির গেরুয়া । যেন একটা মড়ার মাথার প্রকাণ্ড ওষ্ঠহীন হাসি ; যেন দয়াহীন তপ্ত আকাশের কাছে বিপুল একটা শুষ্ক জিহ্বা মস্ত একটা তৃষ্ণার দরখাস্ত মেলিয়া ধরিয়াকে ।

কোন দিকে যাইবে ভাবিতেছে এমন সময় হঠাৎ বালির উপরে পায়ের দাগ চোখে পড়িল । সেই দাগ ধরিয়া চলিতে চলিতে যেখানে গিয়া সে পৌঁছিল সেখানে একটা জলা । তার ধারে ধারে ভিজা মাটির উপরে অসংখ্য পাখির পদচিহ্ন । সেইখানে বালির পাড়ির ছায়ায় শচীশ বসিয়া । সামনের জলাটি একেবারে নীলে নীল, ধারে ধারে চঞ্চল কাদাখোঁচা লেজ নাচাইয়া সাদা-কালো ডানার বালক দিতেছে । কিছু দূরে চখা-চখীর দল ভারি গোলমাল করিতে করিতে কিছুতেই পিঠের পালক পুরাপুরি মনের মতো সাফ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না । দামিনী পাড়ির উপর দাঁড়াইতেই তারা ডাকিতে ডাকিতে ডানা মেলিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল ।

দামিনীকে দেখিয়া শচীশ বলিয়া উঠিল, এখানে কেন ?

দামিনী বলিল, খাবার আনিয়াছি ।

শচীশ বলিল, খাইব না ।

দামিনী বলিল, অনেক বেলা হইয়া গেছে ।

শচীশ কেবল বলিল, না ।

দামিনী বলিল, আমি নাহয় একটু বসি, তুমি আর-একটু পরে--

শচীশ বলিয়া উঠিল, আহা কেন আমাকে তুমি--

হঠাৎ দামিনীর মুখ দেখিয়া সে থামিয়া গেল । দামিনী আর কিছু বলিল না, থালা হাতে করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল । চারি দিকে শূন্য বালি রাত্রিবেলাকার বাঘের চোখের মতো ঝক্‌ঝক্‌ করিতে লাগিল ।

দামিনীর চোখে আশ্রয় যত সহজে জ্বলে, জল তত সহজে পড়ে না । কিন্তু সেদিন যখন তাকে দেখিলাম, দেখি সে মাটিতে পা ছড়াইয়া বসিয়া ; চোখ দিয়া জল পড়িতেছে । আমাকে দেখিয়া তার কান্না যেন বাঁধ ভাঙিয়া ছুটিয়া পড়িল । আমার বুকের ভিতরটা কেমন করিতে লাগিল । আমি এক পাশে বসিলাম ।

একটু সে সুস্থ হইলে আমি তাকে বলিলাম, শচীশের শরীরের জন্য তুমি এত ভাব কেন ?

দামিনী বলিল, আর কিসের জন্য আমি ভাবিতে পারি বলো । আর-সব ভাবনা তো উনি আপনিই ভাবিতেছেন । আমি কি তার কিছু বুঝি, না আমি তার কিছু করিতে পারি ?

আমি বলিলাম, দেখো, মানুষের মন যখন অত্যন্ত জোরে কিছু একটাতে গিয়া ঠেকে তখন আপনিই তার শরীরের সমস্ত প্রয়োজন কমিয়া যায় । সেইজন্যেই বড়ো দুঃখে কিম্বা বড়ো আনন্দে মানুষের ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকে না । এখন শচীশের যেরকম মনের অবস্থা তাতে ওর শরীরের দিকে যদি মন না দাও ওর ক্ষতি হইবে না ।

দামিনী বলিল, আমি যে স্ত্রীজাত-- ঐ শরীরটাকেই তো দেহ দিয়া প্রাণ দিয়া গড়িয়া তোলা আমাদের স্বধর্ম । ও যে একেবারে মেয়েদের নিজের কীর্তি । তাই যখন দেখি শরীরটা কষ্ট পাইতেছে তখন এত সহজে আমাদের মন কাঁদিয়া উঠে ।

আমি বলিলাম, তাই যারা কেবল মন লইয়া থাকে শরীরের অভিভাবক তোমাদের তারা চোখেই দেখিতে পায় না ।

দামিনী দৃষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিল, পায় না বৈকি ! তারা আবার এমন করিয়া দেখে যে সে একটা অনাসৃষ্টি ।

মনে মনে বলিলাম, সেই অনাসৃষ্টিটার 'পরে তোমাদের লোভের সীমা নাই। ওরে ও শ্রীবিলাস, জন্মান্তরে যেন সৃষ্টিছাড়ার দলে জন্ম নিতে পারিস এমন পুণ্য কর ।

৩

সেদিন নদীর চরে শচীশ দামিনীকে অমন একটা শব্দ ঘা দিয়া তার ফল হইল, দামিনীর সেই কাতর দৃষ্টি শচীশ মন হইতে সরাইতে পারিল না। তার পর কিছুদিন সে দামিনীর 'পরে একটু বিশেষ যত্ন দেখাইয়া অনুতাপের ব্রত যাপন করিতে লাগিল। অনেক দিন সে তো আমাদের সঙ্গে ভালো করিয়া কথাই কয় নাই, এখন সে দামিনীকে কাছে ডাকিয়া তার সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিল। যে-সব তার অনেক ধ্যানের অনেক চিন্তার কথা সেই ছিল তার আলাপের বিষয়।

দামিনী শচীশের ঔদাসীন্যকে ভয় করিত না, কিন্তু এই যত্নকে তার বড়ো ভয়। সে জানিত এতটা সহিবে না, কেননা এর দাম বড়ো বেশি। একদিন হিসাবের দিকে যেই শচীশের নজর পড়িবে, দেখিবে খরচ বড়ো বেশি পড়িতেছে, সেইদিনই বিপদ। শচীশ অত্যন্ত ভালো ছেলের মতো বেশ নিয়মমত স্নানাহার করে, ইহাতে দামিনীর বুক দুর্দুর্ করে, কেমন তার লজ্জা বোধ হয়। শচীশ অবাধ্য হইলে সে যেন বাঁচে। সে মনে মনে বলে, সেদিন তুমি আমাকে দূর করিয়া দিয়াছিলে ভালোই করিয়াছ। আমাকে যত্ন এ যে তোমার আপনাকে শাস্তি দেওয়া। এ আমি সহিব কী করিয়া? দামিনী ভাবিল, দূর হোক গে ছাই, এখানেও দেখিতেছি মেয়েদের সঙ্গে সেই পাতাইয়া আবার আমাকে পাড়া ঘুরিতে হইবে।

একদিন রাতে হঠাৎ ডাক পড়িল, বিশ্রী ! দামিনী ! তখন রাত্রি একটাই হইবে কি দুটাই হইবে শচীশের সে খেয়ালই নাই। রাতে শচীশ কী কাণ্ড করে তা জানি না-- কিন্তু এটা নিশ্চয়, তার উৎপাতে এই ভুতুড়ে বাড়িতে ভূতগুলা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা ঘুম হইতে ধড় ফড় করিয়া জাগিয়া বাহির হইয়া দেখি শচীশ বাড়ির সামনে বাঁধানো চাতালটার উপর অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আছে। সে বলিয়া উঠিল, আমি বেশ করিয়া বুঝিয়াছি। মনে একটুও সন্দেহ নাই।

দামিনী আস্তে আস্তে চাতালটার উপরে বসিল, শচীশও তার অনুকরণ করিয়া অন্যমনে বসিয়া পড়িল। আমিও বসিলাম।

শচীশ বলিল, যে মুখে তিনি আমার দিকে আসিতেছেন আমি যদি সেই মুখেই চলিতে থাকি তবে তাঁর কাছ থেকে কেবল সরিতে থাকিব, আমি ঠিক উলটা মুখে চলিলে তবেই তো মিলন হইবে।

আমি চুপ করিয়া তার জ্বল্জ্বল-করা চোখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে যা বলিল রেখাগণিত-হিসাবে সে কথাটা ঠিক, কিন্তু ব্যাপারটা কী ?

শচীশ বলিয়া চলিল, তিনি রূপ ভালোবাসেন, তাই কেবলই রূপের দিকে নামিয়া আসিতেছেন। আমরা তো শুধু রূপ লইয়া বাঁচি না, আমাদের তাই অরূপের দিকে ছুটিতে হয়। তিনি মুক্ত, তাই তাঁর লীলা বন্ধনে, আমরা বন্ধ, সেইজন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে। এ কথাটা বুঝি না বলিয়াই আমাদের যত দুঃখ।

তারাগুলো যেমন নিস্তরু আমরা তেমনি নিস্তরু হইয়াই রহিলাম। শচীশ বলিল, দামিনী, বুঝিতে পারিতেছ না ? গান যে করে সে আনন্দের দিক হইতে রাগিনীর দিকে যায়, গান যে শোনে সে রাগিনীর

দিক হইতে আনন্দের দিকে যায়। একজন আসে মুক্তি হইতে বন্ধনে, আর-একজন যায় বন্ধন হইতে মুক্তিতে, তবে তো দুই পক্ষের মিল হয়। তিনি যে গাহিয়াছেন আর আমরা যে শুনিতছি। তিনি বাঁধিতে বাঁধিতে শোনান, আমরা খুলিতে খুলিতে শুনি।

দামিনী শচীশের কথা বুঝিতে পারিল কি না জানি না, কিন্তু শচীশকে বুঝিতে পারিল। কোলের উপর হাত জোড় করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

শচীশ বলিল, এতক্ষণ আমি অন্ধকারের এই কোণটিতে চুপ করিয়া বসিয়া সেই ওস্তাদের গান শুনিতছিলাম, শুনিত শুনিত হঠাৎ সমস্ত বুঝিলাম। আর থাকিতে পারিলাম না, তাই তোমাদের ডাকিয়াছি। এতদিন আমি তাঁকে আপনার মতো করিয়া বানাইতে গিয়া কেবল ঠকিলাম। ওগো আমার প্রলয়, আপনাকে আমি তোমার মধ্যে চুরমার করিতে থাকিবডচিরকাল ধরিয়া! বন্ধন আমার নয় বলিয়াই কোনো বন্ধনকে ধরিয়া রাখিতে পারি না, আর বন্ধন তোমারই বলিয়াই অনন্ত কালে তুমি সৃষ্টির বাঁধন ছাড়াইতে পারিলে না। থাকো, আমার রূপ লইয়া তুমি থাকো, আমি তোমার অরূপের মধ্যে ডুব মারিলাম।

‘অসীম, তুমি আমার, তুমি আমার’ এই বলিতে বলিতে শচীশ উঠিয়া অন্ধকারে নদীর পাড়ির দিকে চলিয়া গেল।

8

সেই রাত্রির পর আবার শচীশ সাবেক চাল ধরিল, তার নাওয়া-খাওয়ার ঠিকঠিকানা রহিল না। কখন যে তার মনের ঢেউ আলোর দিকে উঠে, কখন যে তাহা অন্ধকারের দিকে নামিয়া যায় তাহা ভাবিয়া পাই না। এমন মানুষকে ভদ্রলোকের ছেলেটির মতো বেশ খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া সুস্থ করিয়া রাখিবার ভার যে লইয়াছে ভগবান তার সহায় হোন!

সেদিন সমস্ত দিন গুমট করিয়া হঠাৎ রাত্রে ভারী একটা ঝড় আসিল। আমরা তিনজনে তিনটা ঘরে শুই, তার সামনের বারান্দায় কেরোসিনের একটা ডিবা জ্বলে। সেটা নিবিয়া গেছে। নদী তোলপাড় করিয়া উঠিয়াছে, আকাশ ভাঙিয়া মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। সেই নদীর ঢেউয়ের ছলচ্ছল আর আকাশের জলের ঝর্ঝর্ শব্দে উপরে নীচে মিলিয়া প্রলয়ের আসরে ঝামাঝাম করতাল বাজাইতে লাগিল। জমাট অন্ধকারের গর্ভের মধ্যে কী যে নড়াচড়া চলিতেছে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, অথচ তার নানারকমের আওয়াজে সমস্ত আকাশটা অন্ধ ছেলের মতো ভয়ে হিম হইয়া উঠিতেছে। বাঁশবনের মধ্যে যেন একটা বিধবা প্রেতিনীর কান্না, আমবাগানের মধ্যে ডালপালাগুলার ঝপাঝপ শব্দ, দূরে মাঝে মাঝে নদীর পাড়ি ভাঙিয়া হুড়মুড় দুড়ুড়ু করিয়া উঠিতেছে, আর আমাদের জীর্ণ বড়িটার পাঁজরগুলার ফাঁকের ভিতর দিয়া বার বার বাতাসের তীক্ষ্ণ ছুরি বিঁধিয়া সে কেবলই একটা জম্বুর মতো হু হু করিয়া চিৎকার করিতেছে।

এইরকম রাতে আমাদের মনের জানলা-দরজার ছিটকিনিগুলো নড়িয়া যায়, ভিতরে ঝড় ঢুকিয়া পড়ে, ভদ্র আসবাবগুলোকে উলটপালট করিয়া দেয়, পর্দাগুলো ফর্ফর্ করিয়া কে কোন্ দিকে যে অদ্ভুত রকম করিয়া উড়িতে থাকে তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। আমার ঘুম হইতেছিল না। বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া কী-সব কথা ভাবিতছিলাম তাহা এখানে লিখিয়া কী হইবে। এই ইতিহাসে সেগুলো জরুরি কথা নয়।

এমন সময়ে শচীশ একবার তার ঘরের অন্ধকারের মধ্যে বলিয়া উঠিল, কে ও!

উত্তর শুনিল, আমি দামিনী। তোমার জানলা খোলা, ঘরে বৃষ্টির ছাঁট আসিতেছে। বন্ধ করিয়া দিই।
বন্ধ করিতে করিতে দেখিল, শচীশ বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িয়াছে। মুহূর্তকালের জন্য যেন দ্বিধা করিয়া তার পরে বেগে ঘর হইতে সে বাহির হইয়া গেল। বিদ্যৎ চমক দিতে লাগিল এবং একটা চাপা বজ্র গর্গর্ করিয়া উঠিল।

দামিনী অনেকক্ষণ নিজের ঘরের চৌকাঠের 'পরে বসিয়া রহিল। কেহই ফিরিয়া আসিল না। দমকা হাওয়ার অর্ধেক ক্রমেই বাড়িয়া চলিল।

দামিনী আর থাকিতে পারিল না, বাহির হইয়া পড়িল। বাতাসে দাঁড়ানো দায়। মনে হইল, দেবতার পেয়াদাগুলো তাকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে ঠেলা দিয়া লইয়া চলিয়াছে। অন্ধকার আজ সচল হইয়া উঠিল। বৃষ্টির জল আকাশের সমস্ত ফাঁক ভরাট করিবার জন্য প্রাণপণে লাগিয়াছে। এমনি করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ডুবাইয়া কাঁদিতে পারিলে দামিনী বাঁচিত।

হঠাৎ একটা বিদ্যৎ অন্ধকারটাকে আকাশের এক ধার হইতে আর-এক ধার পর্যন্ত পড়পড় শব্দ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। সেই ক্ষণিক আলোকে দামিনী দেখিতে পাইল, শচীশ নদীর ধারে দাঁড়াইয়া। দামিনী প্রাণপণ শক্তিতে উঠিয়া পড়িয়া এক দৌড়ে একেবারে তার পায়ের কাছে আসিয়া পড়িল ; বাতাসের চিৎকারশব্দকে হার মানাইয়া বলিয়া উঠিল, এই তোমার পা ছুঁইয়া বলিতেছি, তোমার কাছে অপরাধ করি নাই, কেন তবে আমাকে এমন করিয়া শাস্তি দিতেছ ?

শচীশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দামিনী বলিল, আমাকে লাথি মারিয়া নদীর মধ্যে ফেলিয়া দিতে চাও তো ফেলিয়া দাও, কিন্তু তুমি ঘরে চলো।

শচীশ বাড়িতে ফিরিয়া আসিল। ভিতরে ঢুকিয়াই বলিল, যাঁকে আমি খুঁজিতেছি তাঁকে আমার বড়ো দরকার ডড আর-কিছুতেই আমার দরকার নাই। দামিনী, তুমি আমাকে দয়া করো, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও।

দামিনী একটুক্কণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তার পরে বলিল, তাই আমি যাইব।

৫

পরে আমি দামিনীর কাছে আগাগোড়া সকল কথাই শুনিয়াছি, কিন্তু সেদিন কিছুই জানিতাম না। তাই বিছানা হইতে যখন দেখিলাম এরা দুজনে সামনের বারান্দা দিয়া আপন আপন ঘরের দিকে গেল তখন মনে হইল, আমার দুর্ভাগ্য বুকুর উপর চাপিয়া বসিয়া আমার গলা টিপিয়া ধরিতেছে। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম, সে রাতে আমার ঘুম হইল না।

পরের দিন সকালে দামিনীর সে কী চেহারা ! কাল রাতে ঝড়ের তাণ্ডবন্ত্য পৃথিবীর মধ্যে কেবল যেন এই মেয়েটির উপরেই আপনার সমস্ত পদচিহ্ন রাখিয়া দিয়া গেছে। ইতিহাসটা কিছুই না জানিয়াও শচীশের উপর আমার ভারি রাগ হইতে লাগিল।

দামিনী আমাকে বলিল, শ্রীবিলাসবাবু, তুমি আমাকে কলিকাতায় পৌঁছাইয়া দিবে চলো।

এটা যে দামিনীর পক্ষে কতবড়ো কঠিন কথা সে আমি বেশ জানি, কিন্তু আমি তাকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম না। ভারী একটা বেদনার মধ্যেও আমি আরাম পাইলাম। দামিনীর এখান হইতে যাওয়াই ভালো। পাহাড়টার উপর ঠেকিতে ঠেকিতে নৌকাটি যে চুরমার হইয়া গেল।

বিদায় লইবার সময় দামিনী শচীশকে প্রণাম করিয়া বলিল, শ্রী চরণে অনেক অপরাধ করিয়াছি, মাপ

করিয়ে।

শচীশ মাটির দিকে চোখ নামাইয়া বলিল, আমিও অনেক অপরাধ করিয়াছি, সমস্ত মাজিয়া ফেলিয়া ক্ষমা লইব।

দামিনীর মধ্যে একটা প্রলয়ের আগুন জ্বলিতেছে, কলিকাতার পথে আসিতে আসিতে তাহা বেশ বৃষ্টিতে পারিলাম। তারই তাপ লাগিয়া আমারও মনটা যেদিন বড়ো বেশি তাতিয়া উঠিয়াছিল সেদিন আমি শচীশকে উদ্দেশ করিয়া কিছু কড়া কথা বলিয়াছিলাম। দামিনী রাগিয়া বলিল, দেখো, তুমি তাঁর সম্বন্ধে আমার সামনে অমন কথা বলিয়ে না। তিনি আমাকে কী-বাঁচান বাঁচাইয়াছেন তুমি তার কী জান? তুমি কেবল আমারই দুঃখের দিকে তাকাও, আমাকে বাঁচাইতে গিয়া তিনি যে দুঃখটা পাইয়াছেন সে দিকে বৃষ্টি তোমার দৃষ্টি নাই? সুন্দরকে মারিতে গিয়াছিল তাই অসুন্দরটা বুকে লাথি খাইয়াছে। বেশ হইয়াছে, বেশ হইয়াছে, খুব ভালো হইয়াছেডড বলিয়া দামিনী বুকে দম্ দম্ করিয়া কিল মারিতে লাগিল। আমি তার হাত চাপিয়া ধরিলাম।

কলিকাতায় সন্ধ্যার সময় আসিয়া তখনই দামিনীকে তার মাসির বাড়ি দিয়া আমি আমার এক পরিচিত মেসে উঠিলাম। আমার জানা লোকে যে আমাকে দেখিল চমকিয়া উঠিল; বলিল, এ কী! তোমার অসুখ করিয়াছে না কী?

পরদিন প্রথম ডাকেই দামিনীর চিঠি পাইলাম, আমাকে লইয়া যাও, এখানে আমার স্থান নাই।

মাসি দামিনীকে ঘরে রাখিবে না। আমাদের নিন্দায় নাকি শহরে টিটি পড়িয়া গেছে। আমরা দল ছাড়ার অল্পকাল পরে সাপ্তাহিক কাগজগুলির পূজার সংখ্যা বাহির হইয়াছে, সুতরাং আমাদের হাড়কাঠ তৈরি ছিল, রক্তপাতের ত্রুটি হয় নাই। শাস্ত্র স্ত্রীপশু-বলি নিষেধ, কিন্তু মানুষের বেলায় ঐটেতেই সব চেয়ে উল্লাস। কাগজে দামিনীর স্পষ্ট করিয়া নাম ছিল না, কিন্তু বদনামটা কিছুমাত্র অস্পষ্ট যাতে না হয় সে কৌশল ছিল। কাজেই দূর সম্পর্কের মাসির বাড়ি দামিনীর পক্ষে ভয়ংকর আঁট হইয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে দামিনীর বাপ মা মারা গেছে, কিন্তু ভইরা কেহ-কেহ আছে বলিয়াই জানি। দামিনীকে তাদের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে ঘাড় নাড়িল; বলিল, তারা বড়ো গরিব।

আসল কথা, দামিনী তাদের মুশকিলে ফেলিতে চায় না। ভয় ছিল, ভাইরাও পাছে জবাব দেয়, 'এখানে জায়গা নাই'। সে আঘাত যে সহিবে না। জিজ্ঞাসা করিলাম, তা হইলে কোথায় যাইবে?

দামিনী বলিল, লীলানন্দস্বামীর কাছে।

লীলানন্দস্বামী! খানিকক্ষণ আমার মুখ দিয়া বাহির হইল না। অদৃষ্টের এ কী নিদারুণ লীলা!

বলিলাম, স্বামীজী কি তোমাকে লইবেন?

দামিনী বলিল, খুশি হইয়া লইবেন।

দামিনী মানুষ চেনে। যারা দলচরের জাত মানুষকে পাইলে সত্যকে পাওয়ার চেয়ে তারা বেশি খুশি হয়। লীলানন্দস্বামীর ওখানে দামিনীর জয়গার টানাটানি হইবে না এটা ঠিকডডকিন্তুডড

ঠিক এমন সংকটের সময় বলিলাম, দামিনী, একটি পথ আছে, যদি অভয় দাও তো বলি।

দামিনী বলিল, বলো, শুনি।

আমি বলিলাম, যদি আমার মতো মানুষকে বিবাহ করা তোমার পক্ষে সম্ভব হয়, তবেডড

দামিনী আমাকে থামাইয়া দিয়া বলিল, ও কী কথা বলিতেছ শ্রীবিলাসবাবু? তুমি কি পাগল হইয়াছ?

আমি বলিলাম, মনে করো-না পাগলই হইয়াছি। পাগল হইলে অনেক কঠিন কথা অতি সহজে

মীসাংসা করিবার শক্তি জন্মায়। পাগলামি আরব্যউপন্যাসের সেই জুতা যা পায়ে দিলে সংসারের হাজার হাজার বাজে কথাগুলো একেবারে ডিঙাইয়া যাওয়া যায়। বাজে কথা! কাকে তুমি বল বাজে কথা?

এই যেমন, লোকে কী বলিবে, ভবিষ্যতে কী ঘটবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

দামিনী বলিল, আর, আসল কথা?

আমি বলিলাম, কাকে বল তুমি আসল কথা?

এই যেমন আমাকে বিবাহ করিলে তোমার কী দশা হইবে।

এইটেই যদি আসল কথা হয় তবে আমি নিশ্চিত। কেননা, আমার দশা এখন যা আছে তার চেয়ে খারাপ হইবে না। দশাটাকে সম্পূর্ণ ঠাঁই-বদল করাইতে পরিলেই বাঁচিতাম, অন্ততপক্ষে পাশ ফিরাইতে পারিলেও একটুখানি আরাম পাওয়া যায়।

আমার মনের ভাব সম্বন্ধে দামিনী কোনোরকম তারে-খবর পায় নাই, সে কথা বিশ্বাস করি না। কিন্তু, এতদিন সে খবরটা তার কাছে দরকারি খবর ছিল না; অন্তত, তার কোনোরকম জবাব দেওয়া নিস্প্রয়োজন ছিল। এতদিন পরে একটা জবাবের দাবি উঠিল।

দামিনী চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। আমি বলিলাম, দামিনী, আমি সংসারে অত্যন্ত সাধারণ মানুষদের মধ্যে একজন--এমন-কি, আমি তার চেয়েও কম, আমি তুচ্ছ। আমাকে বিবাহ করাও যা না - করাও তা, অতএব তোমার ভাবনা কিছুই নাই।

দামিনীর চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসিল। সে বলিল, তুমি যদি সাধারণ মানুষ হইতে তবে কিছুই ভাবিতাম না।

আরো খানিকক্ষণ ভাবিয়া দামিনী আমাকে বলিল, তুমি তো আমাকে জান?

আমি বলিলাম, তুমিও তো আমাকে জান।

এমনি করিয়াই কথাটা পাড়া হইল। যে-সব কথা মুখে হয় নাই তারই পরিমাণ বেশি।

পূর্বেই বলিয়াছি, একদিন আমার ইংরেজি বক্তৃতায় অনেক মন বশ করিয়াছি। এতদিন ফাঁক পাইয়া তাদের অনেকেরই নেশা ছুটিয়াছে। কিন্তু, নরেন এখনো আমাকে বর্তমান যুগের একটা দৈবলব্ধ জিনিস বলিয়াই জানিত। তার একটা বাড়িতে ভাড়াটে আসিতে মাস-দেড়েক দেরি ছিল। আপাতত সেইখানে আমরা আশ্রয় লইলাম।

প্রথম দিনে আমার প্রস্রাবটা চাকা ভাঙিয়া যে মৌনের গর্তটার মধ্যে পড়িল, মনে হইয়াছিল এইখানেই বুঝি হাঁ এবং না দুইয়েরই বাহিরে পড়িয়া সেটা আটক খাইয়া গেল--অন্তত অনেক মেরামত এবং অনেক হেঁইছঁই করিয়া যদি ইহাকে টানিয়া তোলা যায়। কিন্তু, অভাবনীয় পরিহাসে মনোবিজ্ঞানকে ফাঁকি দিবার জন্যই মনের সৃষ্টি। সৃষ্টিকর্তার সেই আনন্দের উচ্চহাস্য এবারকার ফাল্গুনে এই ভাড়াটে বাড়ির দেয়াল কঁটার মধ্যে বার বার ধুনিয়া ধুনিয়া উঠিল।

আমি যে একটা-কিছু, দামিনী এতদিন সে কথা লক্ষ্য করিবার সময় পায় নাই; বোধ করি আর-কোনো দিক হইতে তার চোখে বেশি একটা আলো পড়িয়াছিল। এবারে তার সমস্ত জগৎ সংকীর্ণ হইয়া সেইটুকুতে আসিয়া ঠেকিল যেখানে আমিই কেবল একলা। কাজেই আমাকে সম্পূর্ণ চোখ মেলিয়া দেখা ছাড়া আর উপায় ছিল না। আমার ভাগ্য ভালো, তাই ঠিক এই সময়টাতেই দামিনী আমাকে যেন প্রথম দেখিল।

অনেক নদীপর্বতে সমুদ্রতীরে দামিনীর পাশে পাশে ফিরিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে খোল-করতালের ঝড়ে রসের তানে বাতাসে আশ্বিন লাগিয়াছে। ‘তোমার চরণে আমার পরানে লাগিল প্রেমের ফাঁসি’ এই পদের শিখা নূতন নূতন আখরে স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিয়াছে। তবু পর্দা পুড়িয়া যায় নাই।

কিন্তু, কলিকাতার এই গলিতে এ কী হইল! ঘেঁষাঘেঁষি ঐ বাড়িগুলো চারি দিকে যেন পারিজাতের ফুলের মতো ফুটিয়া উঠিল। বিধাতা তাঁর বাহাদুরি দেখাইলেন বটে! এই ইঁটকাঠগুলোকে তিনি তাঁর গানের সুর করিয়া তুলিলেন। আর, আমার মতো সামান্য মানুষের উপর তিনি কী পরশমণি ছোঁয়াইয়া দিলেন আমি এক মুহূর্তে অসামান্য হইয়া উঠিলাম।

যখন আড়াল থাকে তখন অনন্তকালের ব্যবধান, যখন আড়াল ভাঙে তখন সে এক নিমেষের পালা। আর দেরি হইল না। দামিনী বলিল, আমি একটা স্বপ্নের মধ্যে ছিলাম, কেবল এই একটা ধাক্কার অপেক্ষা ছিল। আমার সেই-তুমি আর এই-তুমির মাঝখানে ওটা কেবল একটা ঘোর আসিয়াছিল। আমার গুরুকে আমি বার বার প্রণাম করি, তিনি আমার এই ঘোর ভাঙাইয়া দিয়াছেন।

আমি দামিনীকে বলিলাম, দামিনী, তুমি অত করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়ো না। বিধাতার এই সৃষ্টিটা যে সুদৃশ্য নয় সে তুমি পূর্বে একদিন যখন আবিষ্কার করিয়াছিলে তখন সহিয়াছিলাম, কিন্তু এখন সহ্য করা ভারি শক্ত হইবে।

দামিনী কহিল, বিধাতার ঐ সৃষ্টিটা যে সুদৃশ্য, আমি সেইটেই আবিষ্কার করিতেছি।

আমি কহিলাম, ইতিহাসে তোমার নাম থাকিবে। উত্তরমেরুর মাঝখানটাতে যে দুঃসাহসিক আপনার নিশান গাড়িবে তার কীর্তিও এর কাছে তুচ্ছ। এ তো দুঃসাধ্য সাধন নয়, এ যে অসাধ্য সাধন।

ফাল্গুন মাসটা এমন অত্যন্ত ছোটো তাহা ইহার পূর্বে কখনো এমন নিঃসংশয়ে বুঝি নাই। কেবলমাত্র ত্রিশটা দিন, দিনগুলোও চব্বিশ ঘন্টার এক মিনিট বেশি নয়। বিধাতার হাতে কাল অনন্ত, তবু এমনতরো বিশ্রী রকমের কৃপণতা কেন আমি তো বুঝিতে পারি না।

দামিনী বলিল, তুমি যে এই পাগলামি করিতে বসিলে তোমার ঘরের লোক--

আমি বলিলাম, তারা আমার সুহৃদ। এবার তারা আমাকে ঘর থেকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবে।

তার পর ?

তার পরে তোমায় আমায় মিলিয়া একেবারে বুনিয়াদ হইতে আগাগোড়া নূতন করিয়া ঘর বানাইব, সে কেবল আমাদের দুজনের সৃষ্টি।

দামিনী কহিল, আর, সেই ঘরের গৃহিণীকে একেবারে গোড়া হইতে বানাইয়া লইতে হইবে। সেও তোমারই হাতের সৃষ্টি হোক, পুরানো কালের ভাঙাচোরা তার কোথাও কিছু না থাক।

ঐত্রমাসে দিন ফেলিয়া একটা বিবাহের বন্দোবস্ত করা গেল। দামিনী আবদার করিল, শচীশকে আনাইতে হইবে।

আমি বলিলাম, কেন ?

তিনি সম্প্রদান করিবেন।

সে পাগলা যে কোথায় ফিরিতেছে তার সম্বন্ধ নাই। চিঠির পর চিঠি লিখি, জবাবই পাই না। নিশ্চয়ই এখনো সেই ভুতুড়ে বাড়িতেই আছে, নহিলে চিঠি ফেরত আসিত। কিন্তু সে কারো চিঠি খুলিয়া পড়ে কি না সন্দেহ।

আমি বলিলাম, দামিনী, তোমাকে নিজে গিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আসিতে হইবে, ‘পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ--

ত্রুটি মার্জনা' এখানে চলিবে না। একলাই যাইতে পারিতাম, কিন্তু আমি ভিত্তি মানুষ। সে হয়তো এতক্ষণে নদীর ওপারে গিয়া চক্রবাকদের পিঠের পালক সাফ করা তদারক করিতেছে, সেখানে তুমি ছাড়া যাইতে পারে এমন বুকের পাটা আর কারো নাই।

দামিনী হাসিয়া কহিল, সেখানে আর কখনো যাইব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম।

আমি বলিলাম, আহার লইয়া যাইবে না এই প্রতিজ্ঞা ; আহারের নিমন্ত্রণ লইয়া যাইবে না কেন ?

এবারে কোনোরকম দুর্ঘটনা ঘটিল না। দুইজনে দুই হাত ধরিয়া শচীশকে কলিকাতায় গ্রেপ্তার করিয়া আনিলাম। ছোটো ছেলে খেলার জিনিস পাইলে যেমন খুশি হয় শচীশ আমাদের বিবাহের ব্যাপার লইয়া তেমনি খুশি হইয়া উঠিল। আমরা ভাবিয়াছিলাম চুপচাপ করিয়া সারিব, শচীশ কিছুতেই তা হইতে দিল না। বিশেষত জ্যাঠামশায়ের সেই মুসলমানপাড়ার দল যখন খবর পাইল তখন তারা এমনি হল্পা করিতে লাগিল যে, পাড়ার লোকে ভাবিল কাবুলের আমির আসিয়াছে বা অন্তত হাইদ্রাবাদের নিজাম।

আরো ধুম হইল কাগজে। পরবারের পূজার সংখ্যায় জোড়া বলি হইল। আমরা অভিশাপ দিব না। জগদম্বা সম্পাদকের তহবিল বৃদ্ধি করুন এবং পাঠকদের নররক্তের নেশায় অন্তত এবারকার মতো কোনো বিঘ্ন না ঘটুক।

শচীশ বলিল, বিশ্রী, তোমরা আমার বাড়িটা ভোগ করো'সে।

আমি বলিলাম, তুমিও আমাদের সঙ্গে আসিয়া যোগ দাও, আবার আমরা কাজে লাগিয়া যাই।

শচীশ বলিল, না, আমার কাজ অন্যত্র !

দামিনী বলিল, আমাদের বউভাতের নিমন্ত্রণ না সারিয়া যাইতে পারিবে না।

বউভাতের নিমন্ত্রণে আহুতদের সংখ্যা অসম্ভব রকম অধিক ছিল না। ছিল ঐ শচীশ।

শচীশ তো বলিল 'আমাদের বাড়িটা আসিয়া ভোগ করো', কিন্তু ভোগটা যে কী সে আমরাই জানি। হরিমোহন সে বাড়ি দখল করিয়া ভাড়াটে বসাইয়া দিয়াছেন। নিজেই ব্যবহার করিতেন, কিন্তু পারলৌকিক লাভ-লোকসান সম্বন্ধে যারা তাঁর মন্ত্রী তারা ভালো বুঝিল না--ওখানে প্লেগে মুসলমান মরিয়াছে। যে ভাড়াটে আসিবে তারও তো একটা--কিন্তু কথাটা তার কাছে চাপিয়া গেলেই হইবে।

বাড়িটা কেমন করিয়া হরিমোহনের হাত হইতে উদ্ধার করা গেল সে অনেক কথা। আমার প্রধান সহায় ছিল পাড়ার মুসলমানরা। আর কিছু নয়, জগমোহনের উইলখানা একবার তাদের দেখাইয়াছিলাম। আমাকে আর উকিলবাড়ি হাঁটাহাঁটি করিতে হয় নাই।

এ পর্যন্ত বাড়ি হইতে বরাবর কিছু সাহায্য পাইয়াছি, সেটা বন্ধ হইয়াছে। আমরা দুই জনে মিলিয়া বিনা সহায়ে ঘর করিতে লাগিলাম, সেই কষ্টেই আমাদের আনন্দ। আমার ছিল রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদের মার্কা ; প্রোফেসারি সহজেই জুটিল। তার উপরে একজামিন-পাসের পেটেন্ট ঔষধ বাহির করিলামড পাঠ্যপুস্তকের মোটা মোটা নোট। আমাদের অভাব অল্পই, এত করিবার দরকার ছিল না। কিন্তু দামিনী বলিল, শচীশকে যেন তার জীবিকার জন্য ভাবিতে না হয় এটা আমাদের দেখা চাই। আর-একটা কথা দামিনী আমাকে বলিল না, আমিও তাকে বলিলাম না-- চুপিচুপি কাজটা সারিতে হইল। দামিনীর ভাইঝি দুটির সৎপাত্রে যাহাতে বিবাহ হয় এবং ভাইপো কয়টা পড়াশুনা করিয়া মানুষ হয়, সেটা দেখিবার শক্তি দামিনীর ভাইদের ছিল না। তারা আমাদের ঘরে ঢুকিতে দেয় না, কিন্তু অর্থসাহায্য জিনিসটার জাতিকুল নাই, বিশেষত সেটাকে যখন গ্রহণমাত্র করাই দরকার--স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন।

কাজেই আমার অন্য কাজের উপর একটা ইংরেজি কাগজের সাব-এডিটরি লইতে হইল। আমি

দামিনীকে না বলিয়া একটা উড়েবামুন, বেহারা এবং একটা চাকরের বন্দোবস্ত করিলাম। দামিনীও আমাকে না বলিয়া পরদিনেই সব ক'টাকে বিদায় করিয়া দিল। আমি আপত্তি করিতেই সে বলিল, তোমরা কেবলই উলটা বুঝিয়া দয়া কর। তুমি খাটিয়া হয়রান হইতেছ, আর আমি যদি না খাটিতে পাই তবে আমার সে দুঃখ আর সে লজ্জা বহিবে কে ?

বাহিরে আমার কাজ আর ভিতরে দামিনীর কাজ, এই দুইয়ে যেন গঙ্গাযমুনার স্রোত মিলিয়া গেল। ইহার উপরে দামিনী পাড়ার ছোটো ছোটো মুসলমান মেয়েদের সেলাই শেখাইতে লাগিয়া গেল। কিছুতেই সে আমার কাছে হার মানিবে না, এই তার পণ।

কলিকাতার এই শহরটাই যে বৃন্দাবন, আর এই প্রাণপণ খাটুনিটাই যে বাঁশির তান, এ কথাটাকে ঠিক সুরে বলিতে পারি এমন কবিত্বশক্তি আমার নাই। কিন্তু দিনগুলি যে গেল সে হাঁটিয়াও নয়, ছুটিয়াও নয়, একেবারে নাচিয়া চলিয়া গেল।

আরো একটা ফাল্গুন কাটিল। তার পর আর কাটিল না।

সেবারে গুহা হইতে ফিরিয়া আসার পর হইতে দামিনীর বুকের মধ্যে একটা ব্যথা হইয়াছিল, সেই ব্যথার কথা সে কাহাকেও বলে নাই। যখন বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিল তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, এই ব্যথা আমার গোপন ঐশ্বর্য, এ আমার পরশমণি। এই যৌতুক লইয়া তবে আমি তোমার কাছে আসিতে পারিয়াছি, নহিলে আমি কি তোমার যোগ্য ?

ডাক্তারেরা এ ব্যামোর একোজনা একোরকমের নামকরণ করিতে লাগিল। তাদের কারো প্রেসক্রিপশনের সঙ্গে কারো মিল হইল না। শেষকালে ভিজিট ও দাওয়াইখানার দেনার আঙুনে আমার সঞ্চিত স্বর্ণটুকু ছাই করিয়া তারা লঙ্কাকাণ্ড সমাধা করিল এবং উত্তরকাণ্ডে মন্ত্রণা দিল, হাওয়া বদল করিতে হইবে। তখন হাওয়া ছাড়া আমার আর বস্তু কিছুই বাকি ছিল না।

দামিনী বলিল, যেখান হইতে ব্যথা বহিয়া আনিয়াছি আমাকে সেই সমুদ্রের ধারে লইয়া যাও--সেখানে হাওয়ার অভাব নাই।

যেদিন মাঘের পূর্ণিমা ফাল্গুনে পড়িল, জোয়ারের ভরা অশ্রুর বেদনায় সমস্ত সমুদ্র ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, সেদিন দামিনী আমার পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।